নিস্টালিনীকরণ (De-Stalinisation) ঃ

স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়ার অভন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। স্টালিনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ রাশিয়ার আইনসভা বা Supreme Soviet-এ ভাষন দানকালে ম্যালেনকভ রুশ পররাষ্ট্র নীতির কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করেছিলেন্। তাতে সোভিয়েত রাশিয়ায় বাণিজ্যের প্রসার, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বিদেশিদের রাশিয়ায় প্রবেশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীর সকল দেশ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সকল সমস্যার সমাধান এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সহাবস্থানের কথা বলা হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম

অধিবেশনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ক্রুশেভ এবং উপপ্রধানমন্ত্রী মিকোয়ান স্টালিনের প্রবর্তিত নীতির তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। এই অধিবেশনে ১৪০০ জন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি ও বিদেশি অতিথিদের সামনে তাঁরা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্টালিনের ব্যক্তি-প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টার সমালোচনা করেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার সমালোচনা করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় স্টালিন প্রবর্তিত পথই একমাত্র পথ নয়, এই মত ঘোষণা করা হয়। ক্রুশেভের জীবনীকার M. Frankland বলেন যে, ক্রুশেভ রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে তিন ঘন্টার ভাষনে স্টালিনকে মহান নেতা থেকে ঘৃণ্য স্বৈরাচারীতে পরিণত করেন এবং তাঁকে 'জারের যোগ্য উত্তরাধিকারী' বলে অভিহিত করেন ("In three hours Khrushchev turned Stalin from the benevolent genius, in whom every Soviet Child was brought up to believe, into a sinister despot, proper heir of the Tsars who had terrified and tormented Russia in her dark past")। বিংশতিতম অধিবেশনে ক্রুশেভ শুরু করেন নিস্টালিনীকরণ, অর্থাৎ স্টালিনের চিন্তাভাবনাকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেন। বার্নস্টাইন ও কাউটস্কির মতে মার্কসবাদের তরলীকরণ শুরু করেন, কট্টর পুঁজিবাদ-বিরোধীতা থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনেন, আর চালু করেন—'তিন শান্তির তত্ত্ব'—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ। এর আগেই যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে লেণিনের মূল তত্ত্ব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অচল বলে রায় দিয়েছিলেন। ক্রুশেভ সেই নীতিকেই স্টালিন বিরোধিতার কাজে লাগিয়েছিলেন। নিস্টালিনীকরণ করতে গিয়ে ক্রুশেভ দুটি নতুন ধারণা প্রচার করেছিলেন—(১) অব-ঔপনিবেশিকতার পরে পুঁজিবাদ—সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, সুতরাং তার সক্রিয় বিরোধিতার আর দরকার নেই। বরং তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রেখে প্রাধান্যের দরাদরি করাই যুক্তিযুক্ত। (২) অধিকাংশ অব-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচারও এখন অপ্রাসঙ্গিক।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে নিকিতা ক্রুশেভ কর্তৃক নিস্টালিনীকরণ অর্থাৎ শান্তিপূর্ব প্রতিযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ নির্দেশ করেন

ক্রুশেভ কয়েকটি নতুন কর্মসূচির কথা বলেন—(১) ক্রুশেভ আনবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের কর্মসূচি' গ্রহণের ওপর জোর দেন। (২) আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুন্ন রেখে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও মার্কিন পুঁজিবাদের মধ্যে 'অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার' ওপরেই তিনি গুরুত্ব দিতে চান। (৩) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় আবদ্ধ থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও

প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশেভের কয়েকটি ঘোষণা

লাতিন আমেরিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে রুশ প্রভাব বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। (৪) বিশ্ব-রাজনীতিতে নির্জোট আন্দোলনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার কথা বলেন। (৫) ১৯৫৫ খ্রিঃ ক্রুশ্চেভের উদ্যোগে গঠিত 'ওয়ারশ চুক্তি জোট' যতটা না সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল সামরিক সমঝোতা-নির্ভর।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্পর্কে স্টালিনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ক্রুশ্চেভ সমর্থন করতেন না। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়। একদিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে নিয়ন্ত্রণবাদ শিথিল করার কথা বলা হয়, অন্যদিকে আন্ত-কমিউনিস্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'এককেন্দ্রিকতার নীতি পরিহার' করা হয়। ক্রুশ্চেভ মস্কো-কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণবাদী সাম্যবাদী আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন। এখানে 'সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বহুকেন্দ্রিকতার নীতি' (Different roads of Socialism) গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, স্টালিন ছিলেন, "এক দেশে সমাজতন্ত্র" (Socialism in one country)-এর প্রধান প্রবক্তা। নীতিগত পরিবর্তনের সূত্র ধরে দু'মাস পরে (এপ্রিল) 'কমিনফর্ম' (Cominform) সংস্থাটি বাতিল করা হয়। এতদিন পর্যন্ত কমিনফর্ম বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখ্য নিয়ন্ত্রক ছিল। সমাজতন্ত্রের ভিন্ন পথ ও মতাদর্শ স্বীকৃতি পায় (Polycentrism)। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিজ নিজ দেশের উপযোগী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সোভিয়েত রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। নিস্টালিনীকরণের সূত্রে রাশিয়ার সর্বত্র স্টালিনের মূর্তি অপসারিত হয়। স্টালিনগ্রাড শহরকে আবার পুরোনো 'ভোলগোগ্রাড' নামে অভিহিত করা হয় ও তাঁর দেহ রেড স্কোয়ারের স্মৃতি মন্দির থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্পর্কে স্টালিনের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন

পোল্যান্ডের বিদ্রোহ (Rebellion of Poland) ঃ

পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট-শাসিত দেশগুলির ওপর ক্রুশ্চেভের 'নিস্টালিনীকরণ অভিযানের গভীর প্রভাব' পড়েছিল। ক্রুশ্চেভের স্টালিনবাদ বিরোধিতা পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরির মতো দেশে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে প্রকৃত স্বশাসনের দাবিতে সংগঠিত গণ আন্দোলনগুলিকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। স্টালিন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে গিয়ে পোল্যাণ্ড বা হাঙ্গেরির মত দেশকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন এবং ঐ সব দেশের ভারী শিল্প ও সামরিক-করণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ভোগ্যপণ্য অর্থনীতির যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধানের আগেই স্টালিনের মৃত্যু হয়েছিল। ফলে স্টালিন বিরোধিতার বীজ সেখানে থেকেই যায়। পরবর্তী পরিস্থিতিতে চাপা অসন্তোষ প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নেবার চেষ্টা করে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে

স্টালিনের যুগে পোল্যাণ্ডে চাপা অসন্তোষ ও শিল্পনগরী পোজ-নানে শ্রমিক বিদ্রোহ

পোল্যান্ডের শিল্পনগরী পোজনানে কয়েক হাজার শ্রমিক উন্নত মজুরি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দাবীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পোলিশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে এই আন্দোলন তীব্র অকার ধারণ করে। আন্দোলনকারী জনতার শ্লোগান ছিল—"রুটি ও স্বাধীনতা" (bread and freedom)। শ্রমিক অসন্তোষের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ এবং কুমারী মেরির উপাসনালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ চেকতোচোওয়া (Czestochowa) শহরে রোমান ক্যাথলিকদের প্রতিরোধ আন্দোলন যুক্ত হয়েছিল। পোল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির টানাপোড়েন এই উত্তেজনা অনেক বাড়িয়ে দেয়। ১৯৫১ খ্রিঃ স্টালিনের নির্দেশে পোল্যান্ডের টিটোপন্থী বা টিটোর অনুগামী উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট নেতা গোমুলকাকে বন্দী করা হয়। কারণ স্টালিনের সন্দেহ ছিল যে, গোমুলকা পোল্যান্ডে নিজস্ব পন্থায় সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পক্ষপাতী। ঐ সময় পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন সোভিয়েতপন্থী নেতা বোলেশ্লাভ বেইরুত (Boleslav Beirut)। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সোভিয়েত-বিরোধী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ খ্রিঃ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম সম্মেলনে ক্রুশ্চেভের ভাষন এবং স্টালিনের বাড়াবাড়ির প্রকাশ্য সমালোচনা পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রভাবিত করেছিল, তাদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে যদি ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার ভিতরে স্টালিনের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে পারেন, তাহলে পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে পারে।

শ্রমজীবি মানুষের অভ্যুত্থানের সূত্র ধরে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস নাগাদ সমগ্র পোল্যান্ডের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পোল্যান্ড থেকে সোভিয়েত সেনাপতিদের অপসারণের দাবী জানানো হয়। গোমুলকা পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টিতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর পশ্চিমী গণতন্ত্রের পক্ষে শ্লোগান দিয়ে প্রতি-বিপ্লবীরা পথে নামে। রুশ ট্রাঙ্ক দিয়ে পোজনান রায়ট থামিয়ে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু স্টালিন-বিরোধী পোলিশ রাজনীতিক গোমুলকা পুনর্বাসিত হন। বিদ্রোহের তীব্রতা ক্রুশ্চেভকে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে ছুটে যেতে বাধ্য করে। ক্রুশ্চেভের ভয় হয়েছিল যে, রাশিয়ায় যে স্টালিন-বিরোধিতার সূচনা তিনি করেছিলেন, তা পোল্যান্ডে সম্পূর্ণ রুশ-বিরোধিতায় পরিণত হতে পারে। ক্রুশ্চেভ কমিউনিস্ট নেতা গোমুলকার সঙ্গে আপোশ রফায় উপনীত হন। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে মলোটোভ, মিকোয়ান ও কাগানোভিচকে নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী রুশ প্রতিনিধিদল পোল্যান্ডে স্থায়ী মীমাংসার জন্য হাজির হয়েছিল। সোভিয়েত সেনা রাশিয়াতে ফিরিয়ে আনা হয়। পোল্যান্ডে 'ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল' করা হয় এবং পোল্যান্ডকে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। এটা ঠিক যে, পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে নিজের মতো স্বাধীনভাবে কাজ চালাতে পারবে, যদিও বৈদেশিক প্রশ্নে রাশিয়ার পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। অপর পক্ষে গোমুলকা

রুশ-বাহিনী দ্বারা পোল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন ঃ গোমুলকার পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

'ওয়ারশ চুক্তি' মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর সরকারে কমিউনিস্ট-বিরোধী স্থান না দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেন। গোমুলকা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডে একটানা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত আপসের তিনটি কারণ ছিল

পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত আপসের প্রধান তিনটি কারণ ছিল। প্রথমত, পোল্যাণ্ডে রুশ সামরিক অভিযান ঘটলে গোটা পূর্ব ইওরোপে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া পড়ত। দ্বিতীয়ত, গোমুলকা উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা হওয়া সত্ত্বেও রুশপন্থী এবং মনেপ্রাণে মার্কিন- বিরোধী ছিলেন। তৃতীয়ত, গোমুলকা ওয়ারশ চুক্তি জোট ত্যাগ করবেন না, এই আশ্বাস দেন। তাই অহেতুক বলপ্রয়োগ না করে গোমুলকার সঙ্গে সমঝোতা করাই ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার নেতাদের কাছে যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। পিটার ক্যালভোকোরেসি লিখেছেন—"The alternative, a direct use of Russian forces in Poland, was too risky because Russian forces might well have been resisted by the Polish army and a fight in Poland could have led to serious trouble in other countries".[১]

হাঙ্গেরির বিপ্লব (Hungarian Revolution) ঃ

হাঙ্গেরিতে স্টালিন-পন্থী নেতা রাকোসির জনবিরোধী নির্যাতন-মূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

হাঙ্গেরির পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। হাঙ্গেরির জনসাধারণ ক্রুশ্চেভের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে ঘোষিত নতুন 'স্টালিনবাদ বিরোধী নীতি' দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্টালিনের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ম্যালেনকভের প্রত্যক্ষ মদতে কট্টর স্টালিনপন্থী নেতা রাকোসি হাঙ্গেরিতে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদটি উদারপন্থী কমিউনিস্ট নেতা ইমরে নেগির কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। দুবছর পর রাশিয়ায় ম্যালেনকভের প্রতিপত্তি হ্রাস পায় এবং এর পর সোভিয়েত নির্দেশে হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট পার্টি নেগিকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুনরায় রাকেসিকে ক্ষমতায় আনে। নেগির উদারনৈতিক শাসন কমিউনিস্টদের মনঃপূত ছিল না। কার্যত এই সময় থেকেই হাঙ্গেরির রক্ষণশীল প্রকৃতির রাকোসি সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়তে থাকে। মোট কথা, দুটি পর্বে হাঙ্গেরিতে রাকেসির শাসনকাল ছিল হাঙ্গেরির গণবিপ্লবের মূল উৎস। রোকেসি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। রাকোসি প্রবল চণ্ডনীতির মাধ্যমে হাঙ্গেরিতে সাম্যবাদকে সুদৃঢ় করতে প্রয়াসী হন। তাঁর সময়কালে হাঙ্গেরির সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হয়। তাঁর জনবিরোধী নির্যাতনমূলক শাসনে অন্তত ২০০০ জন মানুষ প্রাণ হারায় এবং প্রায় ২০০০০ জন হাঙ্গেরিবাসীকে কারাগারে নতুবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে (concentration camps) বা নির্বাসন শিবিরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সময় হাঙ্গেরিতে জনগণ বিক্ষুব্ধ

১. World Politics–Peter Calvocoressi, P. 306.

হয়ে ওঠে। পোল্যাণ্ডের ঘটনাসমূহ হাঙ্গেরির জনগণ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করছিল। তাদের মধ্যে এই মর্মে বিতর্কের সূত্রপাত হয় যে, যদি পোল্যাণ্ডের জনগণ স্টালিনবাদের অবাঞ্ছিত দিকগুলি বর্জন করতে পারে তাহলে হাঙ্গেরিয়ানরা একই উদ্দেশ্য বা লক্ষ কেন অর্জন কতে সক্ষম হবে না। এই বিষয় নিয়ে হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট দলের বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। হাঙ্গেরির বুদ্ধিজীবীরা রাকেসির শাসনের প্রতিবাদে 'পেটোফি সার্কল' (Petofi Circle) নামে এক সাহিত্যসভা গঠন করে বিক্ষোভ দেখায়। পোল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট নেতা গোমুলকার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় হাঙ্গেরিবাসী উৎসাহিত হয় এবং সরকার-বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করে। হাঙ্গেরির বিপ্লবের সূচনা হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্টালিনের আমলে শাস্তিপ্রাপ্ত ও নিহত চার কমিউনিস্ট নেতার সমাধিক্ষেত্র সংস্কারকে কেন্দ্র করে।

ইতিমধ্যে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাকেসিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং হাঙ্গেরিতে ইমরে নেগি প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ইমরে নেগির প্রধানমন্ত্রীত্বকালে হাঙ্গেরির ছাত্রসমাজ দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সোভিয়েত প্রভুত্ববাদের অবসানের দাবীতে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু করে। ইমরে নেগির নেতৃত্বে গঠিত সরকারে অ-কমিউনিস্টদেরও সামিল করা হয় এবং অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ১৯৫৬ খ্রিঃ ৩০শে অক্টোবর নেগি সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে হাঙ্গেরির জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও হাঙ্গেরি থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। নেগির কার্যকলাপ হাঙ্গেরির জন-মানসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্ট পার্টির তেমন প্রভাব ছিল না—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আশাপ্রদ অগ্রগতি হয় নি এবং জনগণের অর্থনৈতিক মানের ক্রমিক অবনতি ঘটে। যদিও ক্রুশ্চেভ এতদিন সবকিছু মেনে নিয়েছিলেন, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর ইমরে নেগি ওয়ারশ চুক্তি থেকে হাঙ্গেরির বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করলে অবস্থা চরমে ওঠে। এর ফলে রাশিয়া চরম মনোভাব নেয় এবং ৪ঠা নভেম্বর, ২৫০০০০ সোভিয়েত সেনা হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট অভিযান করে নির্মম অত্যাচার শুরু করে। নেগি জাতিপুঞ্জের কাছে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে সাহায্য চেয়েও কোন সাড়া পান নি। হাঙ্গেরির বিপ্লবী জনতা রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছিল, যদিও তারা সফল হয় নি। ইমরে নেগি ক্ষমতাচ্যুত হন ও নিহত হন এবং জানস কাদার সোভিয়েত-এর প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসেন। অভ্যুত্থানের সামরিক নেতা পাল মালেটে প্রথমে বন্দী এবং পরে নিহত হন। অপর বিদ্রোহী নেতা মিনজেনসি প্রাণে বাঁচতে মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নেন। উভয় তরফে ব্যাপক সংঘর্ষের ফলে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ মারা যায়। এই সময় প্রায় ২ লক্ষ শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে হাঙ্গেরি ত্যাগ করেছিল। হাঙ্গেরির বেদনাদায়ক ঘটনা-প্রবাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রুশ্চেভের 'তথাকথিত উদারনৈতিক মনোভাব আন্তরিকতাবিহীন'।

সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাদল দ্বারা নিষ্ঠুর-ভাবে হাঙ্গেরিয় বিদ্রোহ দমন

হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন পূর্ব ইওরোপের অন্যান্য সাম্যবাদী দেশগুলিকে সংযত ও আজ্ঞাবাহী আচরণ করার নির্দেশ দেয়। ঐতিহাসিক ডেভিড থমসন লিখেছেন—"The Kadar regime was established by Soviet tanks and machine-guns. The spectacle of the Red Army destroying a genuine workers' government showed Khrushehev's move 'liberal' policy to be a sham, but the fate of Hungary served as a grim warning against similar revolts in the other lands of Eastern Europe।"[১] হাঙ্গেরিয়গণ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করেছিল। তারা হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত আধিপত্যবাদের অবসান চেয়েছিল। তারা হাঙ্গেরি থেকে সোভিয়েত সেনার অপসারণ চেয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া অত্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে হাঙ্গেরিয় বিদ্রোহ দমন করেছিল। হাঙ্গেরির জনগণ সোভিয়েত রাশিয়ার নিষ্ঠুরতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল ও মস্কো সম্পর্কে তাদের ধারণা পাল্টে গিয়েছিল।

হাঙ্গেরিতে জানস কাদারের রুশ আনুগত্যের শাসন

হাঙ্গেরিতে আধিপত্যবাদী সোভিয়েত সামরিক অভিযান সেই সময়ে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। কেন না, ইঙ্গ-ফরাসি গোষ্ঠী তখন সুয়েজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ব্যস্ত ছিল। ঘটনার অনেক পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ করেছিল। হাঙ্গেরিয় নতুন রাষ্ট্রপ্রধান জানস কাদার তাঁর রুশ আনুগত্যের প্রমাণ-স্বরূপ জানিয়েছিলেন কোন নির্বাচন যেমন হবে না তেমনি হাঙ্গেরি কিছুতেই ওয়ারশ চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে না। জানস কাদার ক্রুশ্চেভের সঙ্গে সু সম্পর্ক রেখে চলতেন। দীর্ঘ ৩২ বছর তিনি ক্ষমতায় ছিলেন।

হাঙ্গেরির বিদ্রোহের পশ্চাতে ডি-স্টালিনাইজেশন ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল

পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরির ঘটনার জন্য ডি-স্টালিনাইজেশনের প্রভাব অনেকটা দায়ী ছিল। তাছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আরোপিত ব্যবস্থা পূর্ব ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে স্বাধীনতাস্পৃহাকে জোরালো করে তুলেছিল। বিশেষ করে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খাকে আরও বেশি জোরদার করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশগুলিতে জনগণের তীব্র অসন্তোষ ছিল। পশ্চিম ইওরোপের তুলনায় পূর্ব ইওরোপ অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে ওঠার দরুণ পূর্ব ইওরোপের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। তাই বলা যায়, ডি-স্টালিনাইজেশন একমাত্র কারণ ছিল না। তবে একথা সত্য যে, ডি-স্টালিনাইজেশনের ফলে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরির জনগোষ্ঠী এই জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণে সাহস পেয়েছিল।

হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ ভারত সমর্থন না করলেও সক্রিয়ভাবে

---

১. Europe Since Napoleon–David Thompson, P. 836.

এর বিরুদ্ধে কিছু বলে নি। হাঙ্গোরি সংকটে ভারতের ভূমিকা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। হাঙ্গোরিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বলপ্রয়োগ ঘটলে মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা রুশ হস্তক্ষেপের নিন্দা করে। ভারত তখন সভায় অনুপস্থিত ছিল। নেহেরু ভেবেছিলেন যে, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে সামিল হলে পরবর্তীকালে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতায় ভারতের অসুবিধা হবে। তবে নেগি ও তার সহকর্মীদের হত্যাকাণ্ডকে ভারত মানতে পারে নি। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল। ভারত দু'বছর হাঙ্গোরিতে কোন রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করে নি। রাশিয়াও জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা কালে অনুপস্থিত থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

হাঙ্গোরিতে বিদ্রোহে ভারতের ভূমিকা